ইউনিট ২৪

মাছ আহরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এদেশে অসংখ্য পুকুর ডোবা, খাল বিল, নদ-নদী, হাওর-বাওড় ও বিস্তীর্ণ প্লাবন ভূমি রয়েছে। বাংলাদেশের এ বিশাল জল রাশি অপরিমেয় মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ। এদেশের স্বাদু পানিতে রয়েছে ২৭২ প্রজাতির মাছ ও ২৪ প্রজাতির চিংড়ি এবং সামুদ্রিক উৎসে রয়েছে ৪৭৫ প্রজাতির মাছ ও ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি। এ বিপুল মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সঠিকভাবে মৎস্য আহরণ গুরুত্বপূর্ণ। একই সাথে মাছ পচনশীল দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম হওয়ায় মাছের পুষ্টিমান বজায় রাখার জন্য এবং পচন রোধ করার লক্ষ্যে মাছ আহরণের পর থেকেই সংরক্ষণ করা প্রয়োজন হয়। সঠিকভাবে সংরক্ষিত মাছই বাজারজাতকরণের জন্য উপযুক্ত। এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে মাছ আহরণ, তাজা মাছ সনাক্তকরণ ও মাছ পচনের কারণ, মাছ সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং মাছ ও চিংড়ির প্রক্রিজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ২৪.১

মাছ আহরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মাছ আহরণ কী তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- মৎস্য আহরণের নীতিমালা সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- মৎস্য আহরণের আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- মৎস্য আহরণের সরঞ্জামের শ্রেণীবিন্যাস বলতে ও লিখতে পারবেন।

মাছ আহরণ

নদীমাতৃক বাংলাদেশের পানি সম্পদ অতীতকাল থেকেই অনন্যভাবে সমৃদ্ধ। এদেশের অসংখ্য পুকুর ডোবা, খাল-বিল, নদ-নদী, হাওর-বাঁওড় ও বিস্তীর্ণ প্লাবন ভূমি মৎস্য সম্পদের বিশাল ভান্ডার। এসব জলাশয়ে বিদ্যমান মাছ সংগ্রহ করা বা ধরাকেই মাছ আহরণ বলা হয়। আদিকাল থেকেই মাছ ধরার বা মাছ আহরণ করার বিভিন্ন পদ্ধতি চালু আছে যা মৎস্য শিকার হিসেবে পরিচিত।

জলাশয়ে বিদ্যমান মাছ সংগ্রহ করা বা ধরাকেই মাছ আহরণ বলা হয়।

মৎস্য আহরণ নীতিমালা

বাংলাদেশের বিশাল পানি সম্পদে বিদ্যমান মাছের প্রজাতিসমূহের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য শিকার বা আহরণের ক্ষেত্রে কতগুলো নীতিমালা অনুসরণ করা প্রয়োজন। মৎস্য শিকারের প্রধান নীতিমালাগুলো নিম্নরূপ:

* সঠিক মাত্রায় মাছ আহরণ করতে হবে।
* মাছের ঘনত্বের ভারসাম্য রক্ষা করে মাছ ধরতে হবে।
* মাছ আহরণে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে।
* জলাশয়ে মাছের ঘনত্ব বেশি হলে তা কমাতে হবে।
* অতিরিক্ত মাত্রায় মাছ আহরণ কমাতে হবে।
* নির্দিষ্ট মৌসুমে মাছ ধরা বন্ধ রাখতে হবে।
* নির্দিষ্ট আকারের নীচে মাছ ধরা যাবে না।

মৎস্য আহরণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার

মাছ আহরণের ধরনের ওপর মাছের গুণগত মান অনেকটা নির্ভরশীল। মাছ ধরার সময় মাছের দেহের ক্ষত বিক্ষতের পরিমান যত কম হয় মাছের গুণগতমান তত ভালো হয়। তাই বর্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে মাছ ধরার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে।

মাছ ধরার সময় মাছের দেহের ক্ষত বিক্ষতের পরিমান যত কম হয় মাছের গুণগতমান তত ভালো হয়।

নিম্নে আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ ধরার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো-

১। ট্রলারের ব্যবহার/ মাছ ধরার নৌযানের যান্ত্রিকীকরণ

অতীতে বাংলাদেশে কাঠের তৈরি নৌকা, পাল তোলা নৌকা এবং ভেলা দ্বারা মাছ আহরণ করা হতো। বর্তমানে মাছ ধরার ক্ষেত্রে ইঞ্জিনযুক্ত নৌকা ব্যবহার করা হচ্ছে। ১৯৭০ সালের পর থেকে বাংলাদেশে ট্রলার দ্বারা মাছ আহরণ করা হচ্ছে।

২। কৃত্রিম আঁশের ব্যবহার

অষ্টাদশ শতাব্দির শেষ প্রান্তে কৃত্রিম তন্তু আবিষ্কারের ফলে মাছ ধরার ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। এ সমস্ত কৃত্রিম আঁশ যেমন-নাইলন, ভি-নাইলন, পলি-ভি-নাইলন ও পলিথিন ইত্যাদির আবিষ্কার মাছ আহরণে এক নবযুগের সুচনা করে।

অষ্টাদশ শতাব্দির প্রথম দিকে এদেশে সমস্ত মাছ ধরার জাল প্রাকৃতিক আঁশ যেমন- তুলা, শন ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত ছিল। ফলশ্রুতিতে এগুলো তাড়াতাড়ি পঁচে যেত এবং কম সময় টিকে থাকতো। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দির শেষ প্রান্তে কৃত্রিম তন্তু আবিষ্কারের ফলে মাছ ধরার ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। এ সমস্ত কৃত্রিম আঁশ যেমন-নাইলন, ভি-নাইলন, পলি-ভি-নাইলন ও পলিথিন ইত্যাদির আবিষ্কার মাছ আহরণে এক নবযুগের সুচনা করে। কেননা এসমস্ত তন্তু দ্বারা নির্মিত জাল অধিক টেকসই, স্বাদু ও লোনা উভয় পানিতে ব্যবহার যোগ্য, সহজে সংরক্ষণ করা যায়, অন্য জীব দ্বারা আক্রান্ত হয় না এবং ফাঁস জাল তৈরির জন্য সুবিধাজনক।

৩। মাছের অবস্থান ও সঠিক উপস্থিতি নির্ণয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার

মাছের অবস্থান ও সঠিক উপস্থিতি নির্ণয়ের জন্য বর্তমানে অনেক ধরনের নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন- ইকোসাউন্ডার, ইকোরেঞ্জার, রাডার, এরিয়াল স্কাউটিং, ফিশ ফাইন্ডার ও ট্রান্সডিউসার ইত্যাদি।

মাছ আহরণের সরঞ্জামের শ্রেণীবিন্যাস

মাছ আহরনে যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১। মাছ ধরার জাল,
২। মাছ ধরার ফাঁদ,
৩। মাছ ধরার বড়শি এবং
৪। কোচ জাতীয় যন্ত্রপাতি।

১। মাছ ধরার জাল

ক. ফাঁসজাল	খ. বেড়জাল	গ. তোলা জাল	ঘ. খেপলা জাল	ঙ. ট্রল নেট
i) পুটি জাল ii) কৈ জাল iii) ফাঁস জাল iv) ফুট জাল v) ট্রামেল নেট	i) পার্স সিন নেট ii) লাম্পারা জাল iii) সিন নেট	i) ধর্ম জাল ii) ভেসাল জাল iii) তার জাল	i) ঝাকি জাল ii) তুড়া জাল	i) তলদেশীয় ট্রল নেট ii) মধ্যম পানির ট্রল নেট

২। মাছ ধরার ফাঁদ

ক. চোঙ্গাকৃতি ফাঁদ	খ. বক্স ফাঁদ
i) ডুগাইর ii) উদরা iii) খাদম	i) ভাইর ii) পলো iii) উচা

৩। মাছ ধরার বড়শি

ক. দাওন বড়শি	খ. নল/ডাটি বড়শি	গ. চাঁচরা বড়শি

৪। কোঁচ জাতীয় যন্ত্রপাতি

i) কোঁচ	ii) জুতি	iii) টেটা	iv) এক কাটা

সারমর্ম

জলাশয়ে বিদ্যমান মাছ সংগ্রহ করা বা ধরাকেই মাছ আহরণ বলা হয়। বাংলাদেশের বিশাল পানি সম্পদে বিদ্যমান মাছের প্রজাতি সমূহের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য শিকার বা আহরণের ক্ষেত্রে প্রধান নীতিমালাগুলো অনুসরণ করা প্রয়োজন। মাছ ধরার সময় মাছের দেহের ক্ষত বিক্ষতের পরিমাণ যত কম হয় মাছের গুণগতমান তত ভালো হয়। মাছের অবস্থান ও সঠিক উপস্থিতি নির্ণয়ের জন্য বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হচ্ছে, যেমন- ইকোসাউন্ডার, ইকোরেঞ্জার, রাডার, এরিয়াল স্কাউটিং, ফিশ ফাইন্ডার ও ট্রান্সডিউসার। মাছ আহরণে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিগুলোকে প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- মাছ ধরার জাল, মাছ ধরার ফাঁদ, মাছ ধরার বড়শি এবং কোচ জাতীয় যন্ত্রপাতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২৪.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। কোন্‌টি কৃত্রিম আঁশ নয়?
- (ক) নাইলন
- (খ) ভি-নাইলন
- (গ) তুলা
- (ঘ) পলি-ভি-নাইলন

২। মাছের অবস্থান ও সঠিক উপস্থিতি নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি কোন্‌টি?
- (ক) ইকোসাউন্ডার
- (খ) ইকোরেঞ্জার
- (গ) রাডার
- (ঘ) উপরের সবকটি

৩। কোন্‌টি ফাঁস জাল নয়?
- (ক) পুঁটি জাল
- (খ) ভেসাল জাল
- (গ) ফুট জাল
- (ঘ) ট্রামেল নেট

উত্তরমালাঃ ১। গ ২। ঘ ৩। খ

পাঠ ২৪.২

তাজা মাছ সনাক্তকরণ ও মাছ পঁচনের কারণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- তাজা মাছ কী তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- তাজা মাছ সনাক্ত করতে পারবেন।
- মাছ পঁচনের কারণ বলতে ও লিখতে পারবেন।

তাজা মাছ

সদ্য ধৃত মাছ যেগুলোকে সংরক্ষণ করা হয়নি সেগুলোকে তাজা মাছ বলা হয়।

সদ্য ধৃত মাছ যেগুলোকে সংরক্ষণ করা হয়নি সেগুলোকে তাজা মাছ বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, মাছের গুণগত মান সঠিক রয়েছে এবং কোন প্রকার পঁচন দেখা দেয়নি তাদেরকে তাজা মাছ বলে।

একটি মাছ তাজা না পঁচা তা বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমে সনাক্ত করা যায়। তাজা মাছ সনাক্তকরণের সবচেয়ে সহজ ও প্রচলিত পদ্ধতিটি হলো অর্গানোলেপটিক পদ্ধতি বা ইন্দ্রিয় পদ্ধতি। এটি একটি সঠিক ও প্রচলিত পদ্ধতি যা বিভিন্ন মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতিতে সাধারণত চামড়া, ত্বক, স্পর্শ, বর্ণ, গন্ধ ও ফুলকার অবস্থা ইত্যাদি বাহ্যিক লক্ষণগুলো পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মাছ তাজা বা পঁচা সনাক্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে মাছকে বিভিন্ন গ্রেড করে তার গুণগত মান পরীক্ষা করে দেখা হয়। আর এ গ্রেডিং করা হয় মাছের ডিফেক্ট পয়েন্টগুলোকে সর্বমোট ডিফেক্ট পয়েন্ট দ্বারা ভাগ করে। সাধারণত মাছের কতগুলো বিকৃত গুণাগুণের ওপর ভিত্তি করে এটি করা হয়। সবশেষে ডিফেক্ট পয়েন্টগুলোর যোগফলকে ভাগ করে মাছের গ্রেডিং করা হয়।

তাজা মাছ সনাক্তকরণের সবচেয়ে সহজ ও প্রচলিত পদ্ধতিটি হলো অর্গানোলেপটিক পদ্ধতি বা ইন্দ্রিয় পদ্ধতি।

মাছের গ্রেডিং

গ্রেড	গ্রেডের মান	তাজা অবস্থার মাত্রা
এ	২ এর কম	খুবই ভালো/গ্রহণযোগ্য
বি	২ থেকে ৫ এর কম	ভালো/গ্রহণযোগ্য
সি	৫	খারাপ/পঁচা

বাহ্যিক প্রক্রিয়ায় তাজা মাছ সনাক্তকরণের উপায় নিম্নরূপঃ

পরীক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য	পর্যবেক্ষণ	গ্রেডের মান	তাজা অবস্থার মাত্রা
১। চামড়া	ক) চামড়া উজ্জল, চকচকে, কোনো ক্ষতের চিহ্ন নেই	১	তাজা, গ্রহণযোগ্য
	খ) চামড়া মোমের মত কিছুটা লাবন্য হারিয়েছে, খুবই সামান্য ক্ষত	২	তাজা, গ্রহণযোগ্য
	গ) চামড়া শুকিয়ে গিয়েছে এবং কিছুটা খসে পড়েছে	৩	তাজা, গ্রহণযোগ্য
	ঘ) চামড়া শুকিয়ে গিয়েছে সম্পূর্ণরূপে খসে পড়েছে	৫	পঁচা, গ্রহণযোগ্য নয়
২ বাইরের স্লেষ্মা	ক) স্বচ্ছ অথবা পানির ন্যায়	১	তাজা, গ্রহণযোগ্য
	খ) দুধের ন্যায়	২	তাজা, গ্রহণযোগ্য
	গ) হলদে ধুসর বর্ণের, কিছুটা জমাটবদ্ধ	৩	তাজা গ্রহণযোগ্য
	ঘ) হলদে বাদামি বর্ণের, খুবই জমে গিয়েছে	৫	পঁচা, গ্রহণযোগ্য নয়
৩। চোখ	ক) উজ্জল কালো পিউপিল, কর্ণিয়া স্বচ্ছ।	১	তাজা, গ্রহণযোগ্য
	খ) সমতল, কিছুটা ঘোলাটে পিউপিল, কর্ণিয়া কিছুটা অস্বচ্ছ	২	তাজা গ্রহণযোগ্য
	গ) সামান্য অবতল, ধুসর বর্ণের পিউপিল, কর্ণিয়া অস্বচ্ছ	৩	তাজা, গ্রহণযোগ্য
	ঘ) সম্পূর্ণরূপে ভিতরের দিকে ঢোকানো ধূসর বর্ণের পিউপিল, কর্ণিয়া বিচ্ছিন্ন	৫	পঁচা, গ্রহণযোগ্য নয়
৪। ফুলকা	ক) উজ্জ্বল লাল, মিউকাস স্বচ্ছ	১	তাজা, গ্রহণযোগ্য
	খ) গোলাপী বর্ণের, মিউকাস কিছুটা অস্বচ্ছ	২	তাজা, গ্রহণযোগ্য
	গ) ধুসর বর্ণের, খসে পড়েছে, মিউকাস অস্বচ্ছ এবং সরু	৩	তাজা, গ্রহণযোগ্য
	ঘ) বাদামি বর্ণের, খসে পড়েছে, মিউকাস বাদামি, ধুসর জমাট বাধা	৫	পঁচা, গ্রহণযোগ্য নয়
৫। ফুলকার গন্ধ	ক) তাজা, সামুদ্রিক আগাছার গন্ধযুক্ত	১	তাজা, গ্রহণযোগ্য
	খ) কোনো গন্ধ নেই, স্বাভাবিক গন্ধ, সামান্য ক্ষিপ্ত	২	তাজা, গ্রহণযোগ্য
	গ) সাংঘাতিকভাবে ক্ষিপ্ত,	৩	তাজা, গ্রহণযোগ্য

	ইঁদুরের ন্যায় মেটে রঙের গন্ধযুক্ত ঘ) এসিটিক, ফলের ন্যায় গন্ধ, অ্যামাইন, সালফাইডের ন্যায় গন্ধযুক্ত	৪	পঁচা, গ্রহণযোগ্য নয়
৬। মাছের মাংসের দৃঢ়তা	ক) দৃঢ় এবং সংস্পর্শে সংবেদনশীল	১	তাজা, গ্রহণযোগ্য
	খ) মাঝে মধ্যে কিছুটা নরম	২	তাজা, গ্রহণযোগ্য
	গ) অধিকতর নরম ও কিছুটা সংবেদনশীলতা হারিয়েছে	৩	তাজা, গ্রহণযোগ্য
	ঘ) সাধারনত নরম ও তুলতুলে	৪	পঁচা, গ্রহণযোগ্য নয়
৭। সাধারণ অবস্থা	ক) সম্পূর্ণ বিকশিত বা তারুন্য উজ্জ্বল ও অক্ষত	১	তাজা, গ্রহণযোগ্য
	খ) কিছুটা ঝুলে পড়া এবং কিছুটা তারুণ্য হারিয়েছে	২	তাজা, গ্রহণযোগ্য
	গ) সম্পূর্ণ তারুণ্য হারিয়ে ফেলেছে এবং ঝুলে পড়েছে	৩	তাজা, গ্রহণযোগ্য
	ঘ) পার্শ্বিয় রেখা লাল এবং কোনো সরুজাত নেই	৪	পঁচা, গ্রহণযোগ্য নয়

এছাড়াও মাছের তাজা এবং পঁচা অবস্থা পরীক্ষাকরনের বিভিন্ন রাসায়নিক পদ্ধতি রয়েছে। সেগুলো হলো ১। ভোলাটাইল বেস নাইট্রোজেন কম্পাউন্ডস, ২। ট্রাই মিথাইল এমাইন পরীক্ষা, ৩। হিস্টামিন পরীক্ষা এবং ৪। পারঅক্সাইড পরীক্ষা।

মাছ পঁচার কারণ

মাছ পঁচনের প্রধান তিনটি কারণ হলো- ক) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুজীবের ক্রিয়া-বিক্রিয়া (খ) মাছের দেহের অভ্যন্তরের এনজাইমের ক্রিয়া ও (গ) বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়া।

বিভিন্ন কারণে মাছের পঁচনক্রিয়া শুরু হয়। তবে মাছের পঁচন ক্রিয়া প্রধানত তিনটি উৎস হতে শুরু হয়। নিচে মাছ পঁচনের প্রধান তিনটি কারণ আলোচনা করা হলো-

১। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুজীবের ক্রিয়া-বিক্রিয়া

মাছের দেহের বিভিন্ন অংশ যথা: আইশ, চামড়া, ফুলকা, নাড়িভূড়ি ইত্যাদিতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুজীব বা ব্যাকটেরিয়া থাকে। জীবিত অবস্থায় এসব জীবাণু মাছের কোন প্রকার ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু মাছ মারা যাওয়ার পর আমাদের চারপাশের পরিবেশে বিদ্যমান জীবাণু এবং মাছের পরিচর্যার সময়, মানুষের হাত, পরিবহনে ব্যবহৃত পাত্র থেকে জীবাণু মাছকে সংক্রমিত করতে পারে। মাছ মরার পর মাছের বিভিন্ন অংশের জীবাণু এবং পরিবেশ ও ব্যবহৃত পাত্রের জীবাণু মাছের দেহে এনজাইম নি:সরণ করে মাছের মাংসপেশীকে নরম করে ফলে দ্রুত মাছের পঁচন ক্রিয়া শুরু হয়।

২। মাছের দেহের অভ্যন্তরের এনজাইমের ক্রিয়া

মাছের দেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরনের এনজাইম বিদ্যমান। এসব এনজাইম জীবিত অবস্থায় মাছের উপকারে আসে পক্ষান্তরে মাছ মরে গেলে এগুলো ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জীবিত অবস্থায় মাছ তাদের খাদ্য হজম ও দেহ কোষ গঠনের জন্য এসব এনজাইমকে ব্যবহার করে।

মাছ মারা যাওয়ার পর এসব এনজাইম তাদের দেহে বিদ্যমান থাকায় তাদের ক্রিয়ার ফলে মৃত মাছের কোষ-কলা ভেঙ্গে যায় ও মাছ পঁচতে শুরু করে। মাছের দেহভাঙ্গনের এনজাইমের এ ক্রিয়াকে অটোলাইসিস বলে। অটোলাইসিস এর ফলে মাছের স্বাদ নষ্ট হয়, পেশী নরম হয়, চোখ গর্তের মধ্যে চলে যায় এবং দেহ বিবর্ণ হয়।

৩। বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়া

মাছের দেহ নানা ধরনের রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা গঠিত। তন্মধ্যে আমিষ, স্নেহ বা চর্বি প্রধান। মাছের দেহে শতকরা ৭০-৮০ ভাগ পানি থাকে। মাছের চর্বিতে প্রচুর পরিমান অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড বিদ্যমান। মাছ মরে যাওয়ার পর এসব অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে। মাছের দেহের রাসায়নিক পদার্থ সমূহে এ ধরনের ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে মাছের জীবকোষ ভেঙ্গে যায়। মাছের স্বাভাবিক বর্ণ ও স্বাদ নষ্ট হয় এবং মাছ পঁচতে শুরু করে। এ ছাড়াও ভৌত কারণসমূহ; যেমন- পোকা-মাকড়ের আক্রমন, শারিরীকভাবে আঘাত জনিত কারণে মাছের পঁচন হয়।

সারমর্ম

সদ্য ধৃত মাছ যেগুলোকে সংরক্ষণ করা হয়নি সেগুলোকে তাজা মাছ বলা হয়। একটি মাছ তাজা না পঁচা তা বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমে সনাক্ত করা যায়। তাজা মাছ সনাক্তকরণের সবচেয়ে সহজ ও প্রচলিত পদ্ধতিটি হলো অর্গানোলেপটিক বা ইন্দ্রিয় পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে সাধারণত চামড়া, ত্বক, স্পর্শ, বর্ণ, গন্ধ ও ফুলকার অবস্থা ইত্যাদি বাহ্যিক লক্ষণগুলো পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মাছ তাজা বা পঁচা সনাক্ত করা হয়। মাছের তাজা ও পঁচা অবস্থা পরীক্ষাকরণের রাসায়নিক পদ্ধতিগুলো হলো - ক) ভোলাটাইল বেস নাইট্রোজেন কম্পাউন্ডস, খ) ট্রাই মিথাইল এমাইন পরীক্ষা, গ) হিস্টামিন পরীক্ষা এবং ঘ) পার-অক্সাইড পরীক্ষা। মাছ পঁচার প্রধান তিনটি কারণ হলো- ক) মাছের দেহের অভ্যন্তরের এনজাইমের ক্রিয়া, খ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুজীবের ক্রিয়া-বিক্রিয়া এবং গ) বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়া।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২৪.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ইন্দ্রিয় পদ্ধতিতে গ্রেডের মান ২ এর কম হলে তা কী নির্দেশ করে?
(ক) খুবই ভালো/গ্রহণযোগ্য (খ) ভালো/গ্রহণযোগ্য
(গ) খারাপ/পঁচা (ঘ) কোনটিই নয়

২। মাছ পঁচনের প্রধান কারণ কয়টি?
(ক) ১টি (খ) ২টি
(গ) ৩টি (ঘ) ৫টি

উত্তরমালাঃ ১। ক ২। গ

পাঠ ২৪.৩

মাছ সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মাছ সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতির নাম বলতে ও লিখতে পারবেন।
- মাছ সংরক্ষণের সুবিধা ও অসুবিধা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

মাছ সংরক্ষণের পদ্ধতি

বিভিন্ন পদ্ধতিতে মাছ সংরক্ষণ করা যায়। সকল পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হলো মাছের গুণগত মান ঠিক রাখা। মাছ বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংরক্ষণের কারণে সংরক্ষিত মাছের গন্ধ, বর্ণ, স্বাদ ও বাহ্যিক গঠনে কিছুটা পরিবর্তন হয়, মাছ সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলোর নাম নিম্নে দেওয়া হলো-

১। বরফজাতকরণ বা আইসিং (lcing)
২। লবনজাতকরণ বা সল্টিং (Salting)
৩। শুটকীকরণ বা ড্রাইং (Drying)
৪। হিমায়িতকরণ বা ফ্রিজিং (freezing)

বরফজাতকরণ

বরফের সাহায্যে মাছ সংরক্ষণকে বরফজাতকরণ বলে। এটি মাছ সংরক্ষণের একটি স্বল্পকালীন পদ্ধতি।

বরফের সাহায্যে মাছ সংরক্ষণকে বরফজাতকরণ বলে। এটি মাছ সংরক্ষণের একটি স্বল্পকালীন পদ্ধতি। বরফ দিয়ে মাছের দেহের তাপমাত্রা শূণ্য ডিগ্রী সেলসিয়াস ($O^{o}C$) বা এর কাছাকাছি এনে অণুজীবের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বংশ বিস্তার বাধাগ্রস্ত করার মাধ্যমে মাছ সংরক্ষণকে বরফজাতকরণ বলা হয়। বাংলাদেশে মাছ সংরক্ষণের জন্য ব্লক আইস বেশি ব্যবহৃত হয়।

বরফজাতকরণের সুবিধা

বরফের সাহায্যে মাছ সংরক্ষণের অনেক সুবিধা রয়েছে। যথা-

১। যে কোনো মৌসুমে মাছ সংরক্ষণ করা যায়।
২। এ পদ্ধতি অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় সহজ।
৩। আমাদের দেশে বরফ তুলনামূলকভাবে সহজলভ্য।
৪। যে কোনো আকারের মাছ সংরক্ষণ করা যায়।
৫। বরফ ক্ষতিকর নয় এবং মাছের সংস্পর্শে এসে খুব দ্রুত মাছকে ঠান্ডা করে মাছের পঁচন রোধ করে।
৬। সহজেই পরিবহন যোগ্য।
৭। সংরক্ষিত মাছের শরীরে বিদ্যমান ব্যাকটেরিয়া, রক্ত ও ময়লা গলিত বরফের পানি দ্বারা ধুয়ে পরিস্কার হয়ে যায় যা সংরক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশে বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণের প্রচলিত পদ্ধতি

বাংলাদেশে বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণের প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রথম মাছকে সাধারণ পানি দ্বারা ধুয়ে নেয়া হয়। মাছের আঁশ বা নাড়ীভূড়ি বের করা হয় না। অত:পর বাঁশের চাটাই বা মাদুরের তৈরি টুকরীতে বরফ ও মাছ স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখা হয়। সাধারণত ৪ ভাগ মাছের সাথে এক ভাগ বরফ দেয়া হয়। সাধারণত পরিবহন দূরত্ব ও সময়ের ওপর ভিত্তি করে বরফের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। বড় আকারের বরফের ব্লককে গুড়া করে ব্যবহার করা হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ মাছ ও বরফ পাত্রে রাখার পর মাদুর বা চটের টুকরা দিয়ে ঢেকে সেলাই করা হয়। পরে কাঠের বাক্সে করে দূরবর্তী স্থানে পরিবহণ করা হয়। বাংলাদেশে সাধারণত ইলিশ মাছ এভাবে দূরবর্তী স্থানে পরিবহণ করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে অধিক মাছ এক সাথে প্যাকিং করার ফলে উপরের মাছের চাপে নিচের মাছের গায়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। বরফ ও মাছের যথাযথ অনুপাত এবং সঠিক পাত্র ব্যবহার করে মাছকে বরফজাত করে ৭-১০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

বরফ ও মাছের যথাযথ অনুপাত এবং সঠিক পাত্র ব্যবহার করে মাছকে বরফজাত করে ৭-১০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণের অসুবিধা

১। বরফ তৈরিতে অধিকাংশ সময়ই অপরিস্কার পানি ব্যবহার করা হয় বিধায় ব্যাকটেরিয়া ও অণুজীব দ্বারা মাছ সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
২। তাপ কুপরিবাহী পাত্র ব্যবহার করা না হলে বরফের কার্যকারিতা ক্ষণস্থায়ী হয়।
৩। ব্যবহৃত বরফের টুকরা বড় হলে মাছের শরীরে ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে।
৪। বরফ ও মাছের অনুপাত সঠিক মাত্রায় ব্যবহৃত হয় না বলে মাছের পুষ্টিমান ঠিক থাকে না।
৫। সংরক্ষণের সময় ব্যবহৃত পাত্র ভালোভাবে পরিস্কার না করার ফলে ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণু দ্বারা মাছ সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণের অসুবিধা দূর করার উপায়

প্রচলিত পদ্ধতিতে বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিরাজমান অসুবিধা বা ত্রুটিসমূহ দূরীকরণ এবং মাছের গুণগতমান বাড়ানোর জন্য নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত।

১। সংরক্ষণের সময় ব্যবহৃত মাছগুলো সবসময় সতেজ বা টাটকা হওয়া উচিত।
২। একই প্রজাতির একই আকারের মাছ এক পাত্রে সংরক্ষণ করা উচিত।
৩। বরফ তৈরিতে ব্যবহৃত পানি পরিস্কার হওয়া বাঞ্চনীয়।
৪। বড় আকারের মাছ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মাছের দেহ হতে নাড়ীভূড়ি সরিয়ে ফেলতে হয়।
৫। বরফ ও মাছের অনুপাত সঠিক রাখা উচিত। বাংলাদেশে শীতকালে বরফ ও মাছের অনুপাত ১:২ এবং গ্রীষ্মকালে ১:১ হওয়া উচিত।
৬। মাছ সংরক্ষণ কাজে ব্যবহৃত পাত্র ও সরঞ্জামাদি সবসময় জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে।
৭। পাত্রে বরফ ও মাছ এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে করে পাত্রের বরফ গলিত পানি, মাছের ময়লা ও রক্ত সহজেই পাত্রের নিচে দিয়ে চুইয়ে যায়।
৮। মাছ সংরক্ষণের সময় ঝুড়ি বা পাত্রে প্রথমেই এক স্তর বরফ দিতে হবে। তারপর মাছ বরফ এভাবে স্তরে স্তরে সাজাতে হবে এবং সবশেষে পাত্রের উপরের মুখ বন্ধ করার পূর্বে পুনরায় উপরে আরেক স্তর বরফ দেয়া উচিত।

বাংলাদেশে শীতকালে বরফ ও মাছের অনুপাত ১:২ এবং গ্রীষ্মকালে ১:১ হওয়া উচিত।

সারমর্মঃ

বিভিন্ন পদ্ধতিতে মাছ সংরক্ষণ করা যায়। আর সকল পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হলো মাছের গুণগতমান ঠিক রাখা। মাছ সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলো হলো- ক) বরফজাতকরণ, খ) লবণজাতকরণ, গ) শুটকীকরণ এবং ঘ) হিমায়িতকরণ। বরফের সাহায্যে মাছ সংরক্ষণকে বরফজাতকরণ বলা হয়। এটি মাছ সংরক্ষরণের একটি স্বল্পকালীন পদ্ধতি। বরফ ও মাছের যথাযথ অনুপাত এবং সঠিক পাত্র ব্যবহার করে মাছকে বরফজাত করে ৭-১০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। বাংলাদেশে শীতকালে বরফ ও মাছের অনুপাত ১:২ এবং গ্রীষ্মকালে ১:১ হওয়া উচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২৪.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। গ্রীষ্মকালে বরফ ও মাছের অনুপাত কত হওয়া উচিত?
- (ক) ১:২
- (খ) ১:১
- (গ) ২:৩
- (ঘ) ১:৩

২। মাছকে বরফজাত করে কত দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়?
- (ক) ৭-১০ দিন
- (খ) ১১-১৫ দিন
- (গ) ২০ দিন
- (ঘ) ৩৬৫ দিন

উত্তরমালাঃ ১। খ ২। ক

পাঠ ২৪.৪

মাছ ও চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মাছ ও চিংড়ির প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- মাছ ও চিংড়ির বাজারজাতকরণ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মাছ ও চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ

মাছ ও চিংড়ি পচনশীল দ্রব্য তাই এদের আহরণের পর দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণের জন্য সঠিক প্রক্রিয়ায় প্রক্রিয়াজাতকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রক্রিয়ায় যে কোনো ধরনের ত্রুটি বা অবহেলার জন্য একদিকে যেমন মাছ বা চিংড়ির পঁচন ধরে অপরদিকে এদের বাজারজাতকরণও বাধাগ্রস্ত হয়। মাছ ও চিংড়ির বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রক্রিয়ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হিসেবে এ পাঠে টিনজাতকরণ ও ধুমায়িতকরণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

টিনজাতকরণ

টিনজাতকরণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে মাছকে সম্পূর্ণরূপে বায়ুশূন্য পাত্রে আবদ্ধ করে অতি উচ্চ তাপমাত্রা প্রয়োগের মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে জীবাণু মুক্ত করা হয়। এ পদ্ধতিতে ২-১০ বছর পর্যন্ত মৎস্য সামগ্রী সংরক্ষণ করা যায়।

টিনজাতকরণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে মাছকে সম্পূর্ণরূপে বায়ুশূন্য পাত্রে আবদ্ধ করে অতি উচ্চ তাপমাত্রা প্রয়োগের মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে জীবাণু মুক্ত করা হয়।

টিনজাতকরণ পদ্ধতি

টিনজাতকরণ পদ্ধতি বেশ কয়েকটি ধাপে সম্পূর্ণ হয়। এ পদ্ধতির বিভিন্ন ধাপসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ধৌতকরণ

মাছ ও চিংড়ি ধরার পর প্রথমে ভালোভাবে ধৌত করতে হয়।

ড্রেসিং ও গাটিং

প্রথমে মাছের আইশ, পাখনা, নাড়ি-ভূড়ি দেহ থেকে ফেলে দেয়া হয়।

কাঁচামাল নির্বাচন

মাংশল ও চর্বিযুক্ত টাটকা মাছ ও চিংড়ি টিনজাতকরণের জন্য উপযুক্ত।

টিন বা কৌটা ভর্তিকরণ

কৌটা হিসেবে টিনের পাত্র বেশি ব্যবহৃত হয় তবে ক্ষেত্র বিশেষে অ্যালুমিনিয়াম বা কাঁচের পাত্র ব্যবহৃত হয়। কৌটাকে হাত বা মেশিনের সাহায্যে পূর্ণ করা হয়। সাধারণত কৌটার

উপরিভাগে সামান্য পরিমাণ জায়গা ফাঁকা রাখা হয় এবং নিষ্ক্রিয় গ্যাস দ্বারা এই ফাঁকা স্থান পূরণ করা হয়।

বিভিন্ন উপাদান সংযোজন
খাদ্যের বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদ বৃদ্ধির জন্য গ্লুটামেট, তেল, টমাটো, সস ও বিভিন্ন ধরণের মসলা জাতীয় উপাদান সংযোজন করা হয়।

বায়ুশূন্যকরণ ও কৌটাবদ্ধকরণ
কৌটার স্ফিতি, জারণ ও টিনের ক্ষয়রোধ করার জন্য কৌটাকে বায়ুশূন্য করা হয় এবং কৌটাকে বন্ধ করা হয়।

কৌটা ধৌতকরণ
বদ্ধকৃত কৌটার গায়ে লেগে থাকা ময়লা পরিস্কার করার জন্য কৌটা ধৌতকরণ করা হয়।

প্রক্রিয়াকরণ ও উত্তপ্তকরণ
উচ্চতাপে কৌটাস্থিত খাদ্যকে বাণিজ্যিকভাবে জীবাণুমুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে ১৫ পাউন্ড/ইঞ্চি চাপে ১২১° সে. তাপমাত্রায় কৌটাকে উত্তপ্ত করা হয়। সাধারণত ২.৫ মিনিট তাপ দিতে হয়।

ঠান্ডাকরণ
তাপ প্রয়োগের ফলে সৃষ্ট কিছু দুর্গন্ধ দূর করার জন্য ঠান্ডা বায়ু বা ঠান্ডা পানি দ্বারা ঠান্ডাকরণ করা হয়।

লেবেলিং
ঠান্ডাকরণ করার পরে কৌটার দ্রব্যের নাম বা কোম্পানীর নাম, পুষ্টিমান, মেয়াদউত্তীর্ণ সময় ইত্যাদি উল্লেখ করে কৌটার গায়ে লেবেলিং করা হয়।

গুদামজাতকরণ
কৌটাজাতকরণের পর পরই উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাত করণ না করেই বেশ কিছুদিন গুদামজাত করা হয়। কাঙ্খিত স্বাদ ও গন্ধ পাওয়ার জন্যই গুদামজাত করা হয়।

ধূমায়িতকরণ হলো মাছ ও চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণের এমন একটি পদ্ধতি যেখানে কাঠ পোড়ানোর ফলে উৎপন্ন ধোয়ার তাপমাত্রা এবং ধোয়া কণার যৌথ ক্রিয়ার মাধ্যমে মাছের দেহ থেকে পানি অপসারিত হয়।

ধূমায়িতকরণ
ধূমায়িতকরণ হলো মাছ ও চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণের এমন একটি পদ্ধতি যেখানে কাঠ পোড়ানোর ফলে উৎপন্ন ধোঁয়ার তাপমাত্রা এবং ধোঁয়া কণার যৌথ ক্রিয়ার মাধ্যমে মাছের দেহ থেকে পানি অপসারিত হয়। মাছ ও চিংড়ির কাঙ্খিত স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধের জন্য বর্তমানে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে এ পদ্ধতি দীর্ঘস্থায়ী না হওয়ায় সংরক্ষণ কাজে এর ব্যবহার সীমিত হয়ে আছে।

ধূমায়িতকরণ পদ্ধতিতে মাছকে ২-৩ সপ্তাহ পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

ধূমায়িতকরণ পদ্ধতি
সাধারণত পরিপক্ক ও চর্বিযুক্ত মাছ এবং চিংড়ি ধূমায়নের জন্য কাঁচা মাল হিসেবে বেশি উপযোগী। ধূমায়নের জন্য বড় মাছকে কেটে ফিলেট করতে হয়। কিন্তু ছোট মাছকে কাটতে হয় না। ব্যাকটেরিয়া ও মোল্ডের বৃদ্ধি রোধ করার জন্য মাছকে ৬০-৭০% লবনে স্বল্প সময়ের জন্য ডুবিয়ে রাখা হয়। এতে পেশিতে ২-৩% লবণ প্রবেশ করে। ধূমায়নের জন্য কাঠের গুড়া

ব্যবহৃত হয়। কাঠের গুড়ায় ১৫% পানি থাকে বিধায় কাঠের গুড়া মোল্ড দ্বারা সংক্রমিত হতে পারে। তাই লবণাক্ত মাছকে কাঠের গুড়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হয়। ধূমায়িত মাছ সাধারণত কাঠের বাক্সে সংরক্ষণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে মাছকে ২-৩ সপ্তাহ পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

মাছ ও চিংড়ির বাজারজাতকরণ

মানুষের চাহিদা ও অভাবের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য বিনিময় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত সকল মানবীয় কার্যক্রমকে বাজারজাতকরণ বলা হয়।

আভ্যন্তরীণ মৎস্য বাজারজাতকরণ

আভ্যন্তরীণ মৎস্য বাজারজাত বা বিপনন ব্যবস্থা সাধারণত একক বা দলগত মৎস্য ব্যবসায়ী অথবা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে। এদের দ্বারা পরিচালিত বেশিরভাগ মৎস্য বাজারে সঠিক পরিচর্যা, ধৌতকরণ, বরফায়ন ও পূর্ণ বরফায়নের তেমন ভালো ব্যবস্থা নেই। গ্রাম অঞ্চলের বাজার গুলোতে বাঁশের ঝুড়িতে করে মাছ এনে মাটিতে রাখা হয়। পরবর্তীতে নিলামের পর শহর অঞ্চলে বিক্রয়ের জন্য পাঠানো হয়। মৎস্য ব্যবসায়ীরা আহরণ পরবর্তী পরিচর্যার চেয়ে অধিক মুনাফা অর্জনের দিকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বাংলাদেশে সরকারী উদ্যেগের অংশ হিসেবে মৎস্য উন্নয়ন সংস্থা আহরিত মাছ আভ্যন্তরীণ ও আর্ন্তজাতিক উভয় বাজারেই বাজারজাতকরণ করে থাকে।

মৎস্য বাজারের প্রকারভেদ

প্রাথমিক বাজার

মাছ ধরার প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ ধরনের বাজার দেখা যায়। এক্ষেত্রে মহাজন বা আড়তদার কাম-মহাজন দালালের মাধ্যমে জেলেদের থেকে মাছ সংগ্রহ করে থাকে। ধৃত মাছের অংশ বিশেষ জেলে অথবা খুচরা বিক্রেতা কর্তৃক স্থানীয়ভাবে বিক্রি হয়ে থাকে।

মাধ্যমিক বাজার

এখানে মহাজনেরা আড়তদার বা কমিশন এজেন্টের মাধ্যমে বেপারী, স্থানীয় পাইকার ও খুচরা বিক্রেতার নিকট মাছ বিক্রি করে থাকে।

উচ্চ মাধ্যমিক বাজার

এক্ষেত্রে বেপারীগণ মাধ্যমিক বাজার থেকে ক্রয়কৃত মাছ আড়তদার বা কমিশন এজেন্টের মাধ্যমে পাইকারী বা খুচরা বিক্রেতাদের নিকট বিক্রি করে থাকে।

চূড়ান্ত বাজার

উচ্চ মাধ্যমিক বাজার থেকে ক্রয়কৃত মাছ পাইকারগণ স্থানীয় খুচরা বিক্রেতা অথবা গ্রাম্য খুচরা বিক্রেতার নিকট বিক্রি করে থাকে। নিম্নে একটি ছকের মাধ্যমে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ মৎস্য বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা দেখানো হলো:-

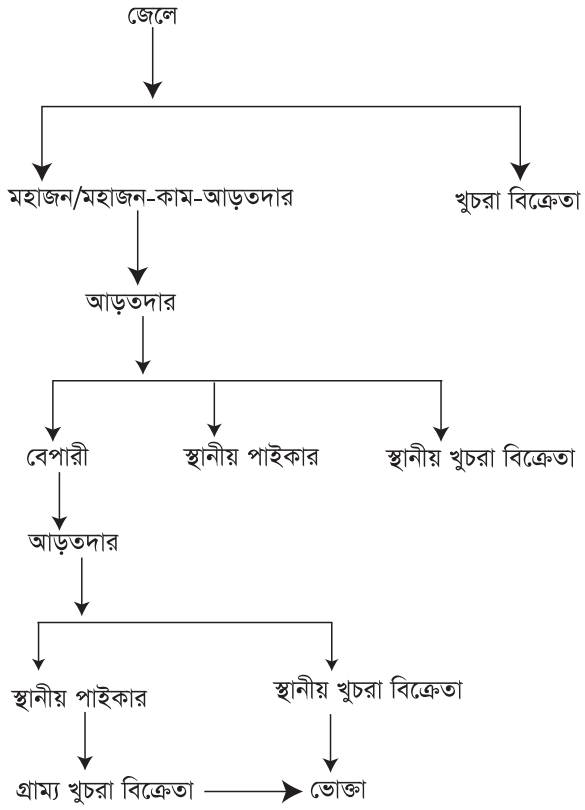

চিত্রঃ ২৪.৪.১ আভ্যন্তরীণ মৎস্য বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা

সারমর্মঃ

মাছ ও চিংড়ী পচনশীল দ্রব্য, তাই এদের আহরণের পর দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণের জন্য সঠিক প্রক্রিয়ায় প্রক্রিয়জাতকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। টিনজাতকরণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে মাছকে সম্পূর্ণরুপে বায়ুশূন্য পাত্রে আবদ্ধ করে অতি উচ্চ তাপমাত্রা প্রয়োগের মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে জীবাণু মুক্ত করা হয়। ধুমায়িতকরণ হলো মাছ ও চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণের এমন একটি পদ্ধতি যেখানে কাঠ পোড়ানোর ফলে উৎপন্ন ধোয়ায় তাপমাত্রা এবং ধোঁয়া কণার যৌথ ক্রিয়ার মাধ্যমে মাছের দেহ থেকে পানি অপসারিত হয়। সাধারণত পরিপক্ক ও চর্বিযুক্ত মাছ এবং চিংড়ি ধূমায়নের জন্য কাঁচামাল হিসেবে বেশি উপযোগী। বাংলাদেশে সরকারী উদ্যোগের অংশ হিসেবে মৎস্য উন্নয়ন সংস্থা আহরিত মাছ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় বাজারেই বাজারজাতকরণ করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২৪.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোন্ ধরনের মাছ টিনজাতকরণের জন্য উপযুক্ত?
(ক) ব্রুড মাছ
(খ) পোনা মাছ
(গ) মাংশল ও চর্বিযুক্ত মাছ
(ঘ) কোনটিই নয়

২। ধূমায়িত পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাতকৃত মাছ কত দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়?
(ক) এক সপ্তাহ
(খ) ২-৩ সপ্তাহ
(গ) ২-৩ মাস
(ঘ) ২-৩ বছর

উত্তরমালাঃ ১। গ ২। খ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ইউনিট-২৪

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১। মাছ আহরণ বলতে কী বোঝায়?
২। মৎস্য শিকারের প্রধান নীতিমালাগুলো কী কী?
৩। মাছের অবস্থান ও সঠিক উপস্থিতি নির্ণয়ের জন্য বর্তমানে ব্যবহৃত নতুন নতুন যন্ত্রপাতির নাম লিখুন।
৪। তাজা মাছ বলতে কী বোঝায়?
৫। মাছ তাজা না পঁচা তা কী কী বাহ্যিক লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে সনাক্ত করা যায়?
৬। মাছ পঁচনের প্রধান তিনটি কারণ কী কী?
৭। বরফজাতকরণ বলতে কী বোঝায়?
৮। বরফজাতকরণের সুবিধাগুলো কী কী?
৯। টিনজাতকরণ বলতে কী বোঝায়?
১০। ধূমায়িতকরণ কী?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। মাছ আহরণের সরঞ্জামের শ্রেণীবিন্যাস লিখুন।
২। বাহ্যিক প্রক্রিয়ায় তাজা মাছ সনাক্তকরণের উপায় বর্ণনা করুন ।
৩। মাছ পঁচার কারণগুলো ব্যাখ্যা করুন।
৪। বাংলাদেশে বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণের প্রচলিত পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
৫। বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণের অসুবিধাগুলো কী কী? এসব অসুবিধা দূর করার উপায়গুলো লিখুন।
৬। টিনজাতকরণ পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
৭। ধূমায়িতকরণ পদ্ধতি আলোচনা করুন ।
৮। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন মৎস্য বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা একটি ছকের মাধ্যমে লিখুন।